ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণাগুলির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মননশীল উদ্যোগ যেমন ছিল, তেমনি ছিল সেইসব ধ্যানধারণাগুলিকে প্রশ্ন করার মানসিকতা। এই বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে আবার ভাববো।

## ৩.২ কৃষক ও উপজাতীয় বিদ্রোহ

পাশ্চাত্যের নৈতিক সমালোচনার জবাবে ভারতীয় উচ্চবর্গের লোকেরা যখন নিজেদের সমাজকে ভেতর থেকে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেন, তখন গ্রামীণ সমাজ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রবঞ্চনার জবাব সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে দিয়েছিল। নগরাশ্রয়ী বুদ্ধিজীবিরা প্রধানত ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের প্রসাদপ্রাপ্ত। তুলনায় পরম্পরাশ্রয়ী উচ্চবর্গের লোকেরা ও কৃষকেরা ঔপনিবেশিক প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে সুযোগসুবিধা হারিয়েছিল। এসবের জবাব তারা দিয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনকে অস্বীকার করে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। পুরোনো আমল ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তারা একের পর এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। মুঘল আমলে ভারতবর্ষে কৃষক বিদ্রোহ ঘটেনি তা নয়। বস্তুত এই ধরনের বিদ্রোহ বারেবারেই ঘটতে থাকে যখন মুঘল কর্তাদের সঙ্গে বোঝাপড়াকে ছাপিয়ে রাজস্ব ধার্য বেড়ে চলে, যখন কৃষকদের ন্যূনতম গ্রাসাচ্ছাদনেও হাত পড়ে এবং যখন আঞ্চলিক মুঘল আমলারা রাজস্ব আদায়ে কঠোর ও অত্যাচারী হয়ে ওঠেন (দ্রষ্টব্য ১.১ অধ্যায়ে)। অত্যাচার করার এই প্রবণতা আরও ছড়িয়ে পড়ে যখন ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য একের পর রাজস্ব আয় চূড়ান্ত করা হয়। কাজেই যে সময় থেকে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম হয়েছিল সেই সময় থেকেই এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।

আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় কোম্পানির সরকার কর্তৃক রাজস্ব সংস্কার ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। নতুন সমাজ কাঠামোটিকে বোঝার জন্য আমরা ডানিয়েল থর্নার ও ডি.এন. ধনাগারে কর্তৃক প্রস্তুত সাধারণ ছক ব্যবহার করব।[৬৭] তবে সেই ছক ব্যবহার করার সময়ে আঞ্চলিক পার্থক্যের কথা মাথায় রাখতে হবে। এই ছকে প্রথম দলে ছিল ভূস্বামী, যাদের বহু সংখ্যক গ্রামে জমির ওপরে মালিকানার অধিকার থাকত। তারা ছিল উপস্বত্বজীবী প্রবাসী জমিদার। জমির দেখাশোনায় বা কৃষির উন্নয়নে তাদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। দ্বিতীয় দলে ছিল ধনী কৃষকেরা। তাদের মধ্যে আবার দুটি উপদল ছিল, যেমন ধনী জমির মালিক ও ধনী প্রজা। ধনী জমির মালিকদের জমির ওপর মালিকানার অধিকার সাধারণত একই গ্রামে থাকত। কৃষিকাজে ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহী হত এরা। যদিও কার্যত কৃষিকাজে অংশ নিত না। অপর পক্ষে ধনী প্রজাদের অনেক জায়গাজমি থাকত। তাদের প্রজাস্বত্ব অধিকারেরও

নিরাপত্তা ছিল। কিন্তু তাদের ভূস্বামীদের তারা সামান্যই কর দিত। তৃতীয় দলে ছিল মাঝারি মাপের কৃষক। তাদের মধ্যে আবার দুটি উপদল ছিল। প্রথম উপদলে ছিল মাঝারি গোছের জমির মালিক বা স্বয়ম্ভর কৃষকেরা যারা নিজেদের পরিবারের শ্রম দিয়েই কৃষিকাজ চালিয়ে নিত। দ্বিতীয় উপদলে ছিল কিছু প্রজা যাদের জমিজায়গা ছিল, কিন্তু অন্যান্য সুবিধাভোগী প্রজাদের চাইতে উচ্চতর হারে কর দিত। চতুর্থ দলে ছিল দরিদ্র কৃষকেরা। এদের সামান্য জায়গাজমি থাকলেও পরিবার প্রতিপালনের মত ক্ষমতা এদের ছিল না। দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে আবার কেউ কেউ ছিল প্রজা। তাদের সামান্য জমি ছিল, কিন্তু কোন প্রজাস্বত্ব অধিকার সংক্রান্ত নিরাপত্তা ছিল না। এবং কেউ কেউ ছিল ভাগচাষী বা অস্থায়ী প্রজা। আর পঞ্চম দলে ছিল, ধনাগারের মতে ভূমিহীন, কৃষি-শ্রমিকেরা।

উপরে যে কাঠামোর পরিচয় দেওয়া হল, সেটি একটি নিয়ম না মেনে করা শ্রেণীবিভাগ, উৎপাদন সম্পর্ক-ভিত্তিক। সব অঞ্চলে সব কয়টি শ্রেণীকে দেখাও যেত না। সাধারণভাবে বলা চলে এখানে একটি পিরামিডাকৃতিবিশিষ্ট কৃষক সমাজ ছিল, যেখানে ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ কৃষক জমির মালিক ছিল না। কৃষক সমাজের এই কাঠামোগত জটিলতা কার্যত উনিশ শতকের শেষেই আরও বেশি করে দেখা দিয়েছিল, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে নয়। ডেভিড হার্ডিম্যানের বর্গীকরণ-সূত্র অনুসারে খুব সাধারণভাবে বলা যেতে পারে ১৮৫৭-এর পূর্বে ভারতীয় কৃষক সমাজে তিনটি শ্রেণী ছিল। প্রথমত ছিল গ্রামীণ ধনিক শ্রেণী ভূস্বামী হিসেবে যাদের ক্ষমতা ছিল ক্রমবর্ধমান। দ্বিতীয়ত ছিল ধনী কৃষক বা খামারের কৃষক-মালিক। আর তৃতীয়ত ছিল দরিদ্র কৃষক।[৬৮] একটা কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, ধনী বা মাঝারি মাপের কৃষকেরা অনেক বেশি স্বনির্ভর হওয়ায় ক্ষমতাশালী ও প্রগতিবাদী ছিল। তাই তারা কৃষক বিদ্রোহও ঘটাতে পারত। কিন্তু আঠারো শতকের শেষে বা উনিশ শতকের গোড়ায় কোম্পানির সরকার ভূমিসংস্কার করে এবং উচ্চহারে রাজস্ব ধার্য করে গোটা ভারতের গ্রামীণ জনসমাজকে এমন সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করে যে, দেশের বিভিন্ন অংশে সর্বস্তরের কৃষকেরাই সহিংস প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিল। আমরা এই অংশে সাধারণভাবে 'কৃষকদে'র বিদ্রোহ নিয়েই আলোচনা করবো, যারা কোম্পানি রাজ ও তার সমর্থক ও সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কৃষকদের অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মতর বিভাজন বা স্তরের কথা এ আলোচনার আসবে না।

ব্রিটিশ আমলের প্রথম শতকে একের পর এক বিদ্রোহ ঘটে, যেগুলিকে ক্যাথলীন গফ বলেছেন "হারিয়ে যাওয়া অধিকারের পুনরুদ্ধারমূলক বিদ্রোহ", যেহেতু এসব ব্রিদ্রোহ শুরু করেছিলেন অসন্তুষ্ট স্থানীয় শাসকেরা, মুঘল আধিকারিকেরা বা জমিহারা জমিদারেরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা স্থানীয় কৃষকেদের সমর্থন পেতেন। কেননা কৃষকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল পুরোনো আমলকে পুনর্বহাল করা বা

প্রচলিত কৃষি সম্পর্কগুলিকে ফিরিয়ে আনা। এই প্রসঙ্গে রাজা চৈত সিংহ এবং অযোধ্যার অন্যান্য জমিদারদের বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে (১৭৭৮–৮১খ্রিঃ), যার অব্যবহিত পরেই ঘটেছিল অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত নবাব ভিজিয়ের আলির বিদ্রোহ (১৭৯৯খ্রিঃ)।[৬৯] অযোধ্যার সমস্যা চলতেই থাকে একেবারে ১৮৩০-এর দশক পর্যন্ত, বিশেষ করে অযোধ্যার উত্তর ও দক্ষিণ অংশে। এতে রাজস্ব আদায়ে সমস্যা দেখা দেয়। এর পরে ঘটে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে বুন্দেলা রাজপুত প্রধানদের বিদ্রোহ। তার ফলে বুন্দেলা অঞ্চলে কৃষিকাজে ও ব্যবসাবাণিজ্যে বেশ কয়েক বছর যাবৎ বিপর্যয় নেমে এসেছিল। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের উত্তর আর্কট অঞ্চলে তিরুনেলভেলি জেলায় এবং অন্ধ্র প্রদেশে কোম্পানিকে সমর্পিত জেলাগুলিতে মাদ্রাজ সরকার স্থানীয় প্রধান বা পলিগারদের তীব্র বিদ্রোহের মুখে পড়ে। কোম্পানির সরকার এদেরকে শুধুই সাময়িক ক্ষমতাভোগী জমিদার হিসেবে দেখত। কিন্তু স্থানীয় কৃষক সমাজ এদেরকে মনে করত সর্বময় প্রভু, যারা মুসলমান আমলেরও আগে বিজয় নগরের শাসনকাল থেকে উত্তরধিকার সূত্রে ক্ষমতা পেয়ে আসছিল। কাজেই সেইসব সর্বময় জমিদার-প্রভুরা যখন কোম্পানির বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে নামত, তখন স্থানীয় কৃষক সমাজ তাদেরকে প্রকাশ্যে সমর্থন করত। এমনকী তাদের অনেকে লোকগাথার নায়কও হয়ে উঠেছিলেন।[৭০] এছাড়া দক্ষিণ ভারতে পঝাসিস্ রাজার বিদ্রোহ গোটা মালাবার উপকূলকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল (১৭৯৬খ্রিঃ–১৮০৫খ্রিঃ)। এরই সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছিল ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ভেলু থাম্পি কর্তৃক প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। স্বেচ্ছাসেবী কৃষক ও পেশাদারী সেনাদের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে থাম্পি এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যেভাবেই হোক ঘটনাক্রমে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এই সমস্ত সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করেছিল। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের রাজস্ব প্রদানের শিথিল শর্তে পুনর্বহাল করা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণত গফের ভাষায় "দৃষ্টান্তমূলক বর্বরতার" সঙ্গে বিদ্রোহীদের দমন করা হত।[৭১] প্রায়ই কৃষকেরা নিজেরাই নিজেদের উদ্যোগে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলত। উত্তরবঙ্গের রঙপুর জেলার বিদ্রোহ (১৭৮৩খ্রিঃ) এরকমই কৃষক বিরোধিতার ভাল উদাহরণ। রাজস্ব আদায়ে ইজারাদারি ব্যবস্থার আমলে প্রথম দিকে রাজস্ব আদায়ের ঠিকাদার ও কোম্পানির কর্মচারীরা কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন চালাত। তাদের ওপরে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ধার্য করত এবং প্রায়ই আইনবহির্ভূত কর আদায় করত। দেবী সিংহ কিংবা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মত রাজস্ব ইজারাদারেরা ছিল জঘন্য অপরাধী। রঙপুর ও দিনাজপুর জেলায় গ্রামে গ্রামে তারা লাগাম ছাড়া সন্ত্রাস চালিয়েছিল। কৃষকেরা এর প্রতিকার চেয়ে প্রথমাবস্থায় কোম্পানির সরকারের কাছে আবেদন জানায়। কিন্তু তাদের সুবিচারের আবেদনে কোম্পানি কর্ণপাত করেনি। তখন তারা নিজেরা সংগঠিত হয়। নিজেদের নেতা নির্বাচন করে, বিশাল

বাহিনী গড়ে তোলে। পুরোনো আমলের তীর-ধনুক ও তরবারি দিয়ে নিজেরা তৈরি হয়ে নেয়। স্থানীয় কাছারি আক্রমণ করে ও শস্যাগার লুট করে। জোর করে বন্দীদের মুক্ত করে আনে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর কৃষকরাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে। উভয় গোষ্ঠীই রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে দেয়। সুগত বসুর ভাষায় "ঔপনিবেশিক-পূর্ব যুগের রাষ্ট্র বাবস্থার প্রতীকগুলি" ব্যবহার করে বিদ্রোহীরা তাদের আন্দোলনকে বৈধ করতে চেয়েছিল। তাদের নেতাকে তারা "নবাব" বলে সম্বোধন করত। তারা নিজেদের স্বাধীন শাসনব্যবস্থা চালু করে এবং সরকারি খরচ চালাবার জন্য করও সংগ্রহ করে। দেবী সিংহের আবেদনে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কোম্পানি তার সেনাবাহিনী পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমন করে। নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমন করার পরে অবশ্য রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার করা হয়।[৭২] সেইরকম দক্ষিণ ভারতেও টিপু সুলতানের চূড়ান্ত পতনের পরে এবং মহীশূরে পুরোনো রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে ধার্য রাজস্ব বেড়ে যায়। সেই বর্ধিত রাজস্ব প্রদানের চাপ শেষমেশ সেই কৃষকদের ঘাড়ে গিয়েই পড়ে। দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা জোর করে যথেচ্ছভাবে রাজস্ব আদায় করত। ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে পড়ে। নাগর প্রদেশে ১৮৩০–৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ্য কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এক্ষেত্রেও বিদ্রোহীরা তাদের নেতাদের নির্বাচন করে নেয়। মহীশূরের শাসকদের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। কিন্তু শেষমেশ তারা ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এই আমলে অধিকাংশ কৃষক আন্দোলনে ধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ধর্ম বিদ্রোহীদের যুক্তিনির্ভর করে তুলত। সেই যুক্তির সাহায্যে কৃষকেরা ঔপনিবেশিক শাসনকে বোঝার চেষ্টা করত। প্রতিরোধের ধারণাও গড়ে তুলত। অন্য কথায় বলা চলে ধর্মই কৃষকদের প্রতিবাদের ভাবাদর্শ গড়ে দিত। প্রতিরোধের প্রথম প্রকাশ ঘটে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহে। ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এসব বিদ্রোহ উত্তরবঙ্গ ও বিহারের সংলগ্ন এলাকাগুলিকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। সামরিক ঐতিহ্যখ্যাত দাসনামী সন্ন্যাসীরা জমি অধিগ্রহণ, মহাজনি ও কাঁচা রেশমের ব্যবসায় সুতিকাপড় ও বনাতের ব্যবসা এবং তামা ও মশলার ব্যবসাতে যুক্ত ছিল। মাদারি ফকিরেরা নিজেদেরকে সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করত, যাদের প্রধান ছিলে শাহ্-ই-মাদার। এরা করমুক্ত জমি ভোগ করত এবং মুঘল আমলে সশস্ত্র অনুগামী রাখত। কোম্পানির উচ্চ রাজস্ব, করমুক্ত জমি ফিরিয়ে নেওয়ায় এবং বাণিজ্যিক একাধিপত্যের প্রভাব সশস্ত্র ভ্রাম্যমাণ সাধুদের ওপরে পড়ে। সশস্ত্র সাধুদের সঙ্গে আরও অনেকেই বিরোধী হয়ে ওঠে, যেমন ১৭৬৯–৭০খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষপীড়িতরা, বিপুল সংখ্যক উৎপীড়িত ছোট জমিদারেরা, বরখাস্ত সেনারা, এবং গ্রামের দরিদ্ররা। দুই ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ভাবাদর্শগত মেলবন্ধন, পারস্পরিক সম্পর্ক, নিজেদের অভ্যন্তরীণ ও অনুগামীদের সঙ্গে সাংগঠনিক যোগাযোগ থাকার ফলে বিদ্রোহীদের সুবিধা হয়েছিল।[৭৩] কোম্পানির সঙ্গে এদের সংঘর্ষ বাধার মূলে ছিল কোম্পানির অসহিষ্ণুতা। অর্থাৎ কোম্পানি এসব

সশস্ত্র সাধুদের ভ্রাম্যমান দলগুলিকে সহ্য করতে পারত না। কেননা, কোম্পানির ধারণায় ছিল একটি স্থায়ী কৃষক সমাজ যা কোনরকম প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ না করে রাজস্ব দিয়ে যাবে। কিন্তু ঐসব সশস্ত্রেরা কোম্পানির সেই ধারণাকে ভেঙে দেয়।[৭৪] এই কারণেই ১৭৬০-এর দশকের শুরু থেকে ১৮০০ অব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত সন্ন্যাসী-ফকিরদের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বারে বারে সংঘর্ষ বাঁধে বাংলা ও বিহারের বিশাল অঞ্চল জুড়ে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ বিদ্রোহে উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৮০০ অব্দের পরে অবশ্য বিদ্রোহ কমে যেতে থাকে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর পরগণাতে আরেকটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেখানে করিম শাহ ও পরে তার উত্তরাধিকারী টিপু শাহ একটি নতুন ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করে গারো, হাজঙ্গ ও হাড়িদের মত হিন্দু উপজাতিদের মধ্যে। এই অঞ্চলে কোম্পানির শাসন কায়েম হবার সঙ্গে সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারি ব্যবস্থা গেড়ে বসে। জমিদারদের বেআইনি খাজনা এবং ডেপুটি কালেক্টর ডানবার কর্তৃক প্রযুক্ত নতুন রাজস্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকেরা অভিযোগ জানায়। এইরকম পরিস্থিতিতে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ টিপু শাহের পাগলপন্থী সম্প্রদায় নতুন শাসনপ্রণালী ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা দানের আশা জাগায়। নতুন এই ধারণা আস্তে আস্তে গোটা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং আস্তে আস্তে সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ নেয়। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির সেনাদের সাহায্য নিয়ে সেই বিদ্রোহকে দমন করতে হয়েছিল।[৭৫]

একই সঙ্গে বাংলার আরেকটি অঞ্চলে আরেকটি ধর্মীয় আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তার নাম তারিকাহ্-ই-মহম্মদীয়। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল তিতুমীর। স্থানীয় জমিদারদের প্রহরী হিসেবে তিতুমীরের জীবন শুরু হয়। পরে তিনি মক্কায় চলে যান। সেখানে সৈয়দ আহ্মেদ বারেলির কাছে দীক্ষা পান। এবং সেখান থেকে দেশে ফিরে ২৪ পরগণা জেলার উত্তর অংশে যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীর দুইপাড়ে ২৫০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে বিশুদ্ধ ইসলাম ধর্মের প্রচার করেন। তাঁর অনুগামীরা প্রধানত ছিল দরিদ্র মুসলমান কৃষক ও তাঁতি। এরা একটি সংগঠিত সম্প্রদায় ছিল। পরিচয় চিহ্নস্বরূপ ছিল নির্দিষ্ট পোশাক ও দাড়ি। ক্ষমতার প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের বিরুদ্ধে কৃষক সম্প্রদায়ের দৃপ্ত প্রতিবাদকে স্থানীয় জমিদারেরা নানা পন্থায় খর্ব করার চেষ্টা করে। যেমন দাড়ি রাখার ওপরে কর চাপিয়ে। তিতুমীর ও তার অনুগামীরা জমিদারদের, নীলকরদের এবং ঔপনিবেশিক সরকারের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে এবং নিজেদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে কর আদায় শুরু করে। এরা গোটা অঞ্চলে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। শেষে সরকারকে সেনাবাহিনী ও গোলোন্দাজ বাহিনী নামাতে হয়েছিল। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর সরকার তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা উড়িয়ে দিয়ে তার আন্দোলনকে ধ্বংস করে।[৭৬]

প্রায় এরই সময়ে পূর্ববঙ্গের কৃষকদের মধ্যে আরেকটি ধর্মীয় আন্দোলন দানা বাঁধে। তার নাম ফারাজী আন্দোলন। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হাজি

শরিয়তুল্লাহ্। উপরোক্ত তারিকাহ্ আন্দোলনের মূল ছিল আঠারো শতকের দিল্লিবাসী শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্-র দার্শনিক ধ্যানধারণার মধ্যে। আন্দোলনে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন রায়বেরিলিবাসী শাহ সৈয়দ আহ্‌মেদ। সৈয়দ আহ্‌মেদের অনুগামীদের ঔপনিবেশিক পরিভাষায় সাধারণ পরিচয় ছিল "ওয়াহাবি" বলে।[৭৭] অন্যদিকে ফারাজী আন্দোলন ছিল মূলত দেশীয়। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমস্ত ইস্‌লামীয় বিশ্বাস ও আচারগুলির শুদ্ধিকরণ অভিযান চলে, কোরানকে তাদের একমাত্র আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হিসেবে তাৎপর্যময় করে। আন্দোলনটির আসল গুরুত্ব ছিল এর সামাজিক উৎসে। পূর্ববঙ্গের গ্রামের গরিব মুসলমানেরা এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে একত্রিত হয়ে জমিদার এবং ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আন্দোলনকারীদের ক্রোধের প্রধান ধাক্কা হিন্দু জমিদারেরাই টের পেয়েছিল। তবে মুসলমান জমিদারেরাও কোনভাবেই নিরাপদ বোধ করত না।[৭৮] ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে শরিয়তুল্লাহ্ মারা যান। আন্দোলনের নেতৃত্ব বর্তায় তাঁর পুত্র দুদু মিয়ার ওপরে। দুদু মিয়া কৃষক সম্প্রদায়কে সর্বসমতাবাদী মতাদর্শের দিকে টেনে নেন। তিনি ঘোষণা করে যে, জমি হল ভগবানের। কাজেই সেই জমির ওপর কর চাপানো বা জমি থেকে কর আদায় করা দৈব বিধি-বিরোধী।[৭৯] দুদু মিয়া ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, পাবনা, ঢাকা, ত্রিপুরা, যশোহর ও নোয়াখালি জেলার গ্রামগুলিকে সংগঠিত করেন তিনি ব্রিটিশ বিচার প্রতিষ্ঠানের বিকল্প হিসেবে স্থানীয় আদালত বসাতেন। তাঁর আন্দোলনের খরচ চালাবার উদ্দেশ্যে কিছু করও সংগ্রহ করতেন। গোটা ১৮৪০-এর এবং ১৮৫০-এর দশক জুড়ে জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সশস্ত্র সংঘর্ষ চলে। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়া মারা যাবার পর আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু ১৮৭০-এর দশকে তাঁর উত্তরাধিকারী নয়া মিয়ার নেতৃত্বে আন্দোলন আবার ভিন্নমাত্রায় নতুন করে শুরু হয় (এবিষয়ে আরও বিশদ আলোচনার জন্য দেখতে হবে ৪.২ অধ্যায়ে)

এই আমলে অনুরূপ আরেকটি কৃষক আন্দোলন দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল। ইতিহাসে সেই আন্দোলন মোপলা বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এক্ষেত্রেও ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মোপলারা বা মোপিলারা ছিল আরব ব্যবসায়ীদের উত্তরপুরুষ। আরব ব্যবসায়ীরা মালাবার অঞ্চলে অনেকদিন আগেই বাসা বেঁধেছিল এবং তারা স্থানীয় নায়ার ও তিয়ার মহিলাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। পরবর্তীকালে চেরুমারদের মত নিম্নজাতের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে এই সম্প্রদায়ের সভ্যসংখ্যা বাড়ে। চেরুমারেরা ছিল একটি দাস জাতি। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে দাসপ্রথা অবলুপ্তি আইন (স্লেভারি অ্যাবোলিশন অ্যাক্ট) পাশ হওয়ার ফলে এদের মুক্তি ঘটে, কিন্তু তার ফলে তারা বৃহত্তর সামাজিক সমস্যায় পড়ে এবং ধর্মান্তরকরণ গ্রহণ করতে থাকে।[৮০] আস্তে আস্তে এই মোপলারা কৃষিনির্ভর হয়ে ওঠে এবং কৃষক-প্রজা সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তাদের অনেকেই ছিল ভূমিহীন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও

জেলে। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশরা মালাবার অধিকার করে নেয় এবং জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার সৃষ্টি করে জমি সংক্রান্ত সম্পর্ককে চাঙ্গা করে তুলতে সচেষ্ট হয়। পরম্পরাগত প্রথা অনুযায়ী এতদিন পর্যন্ত জমিতে উৎপন্ন ফসলের সমান ভাগ—জন্মি (জন্মম্: ভূমিস্বত্ব ভোগদখলকারী), কনমদার/কনক্করণ (কনম: ভূমিস্বত্ব ভোগদখলকারী) এবং কৃষকের মধ্যে। ব্রিটিশ পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে মোপলাদের এই পুরোনো পদ্ধতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুযায়ী জন্মিরাই হলেন জমির চূড়ান্ত মালিক। জমি থেকে প্রজাদের উৎখাত করার অধিকার তাদের দেওয়া হল, যে-অধিকার আগে তাদের কোনদিন ছিল না। অন্য দুটি শ্রেণীকে—কনমদার ও কৃষককে প্রজা ও জমি লিজ নেওয়া ব্যক্তির পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়। তাছাড়া, করের অতিরিক্ত বোঝা, আইন বহির্ভূত করের বিপুল ভার বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের জমিদার ঘেঁষা দৃষ্টিভঙ্গি, ইত্যাদি সব মিলিয়ে কে.এন. পানিক্কর লিখছেন, "মালাবার অঞ্চলে কৃষকেরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে কাজ করে দিনপাত করত ; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রাষ্ট্র ও ভূস্বামীর একত্রে কর আদায়ের জুলুম"।[৮১]

তাই গোটা উনিশ শতক জুড়ে মালাবার অঞ্চলে একের এক ঘটনা ঘটতে থাকে। সেইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের শোষণ ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ প্রকাশিত হয়।[৮২] কৃষিজ এইসব সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল জন্মিদের অধিকাংশই ছিল উচ্চবর্ণীয় হিন্দু, আর কৃষকেরা মুসলমান মোপলা। এই সামাজিক ছাঁচে পরম্পরাগত মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা যেমন বেলিয়ামকোডের উমর কাজী, মাম্বুরামের সৈয়দ অলাবী টঙ্গল, ও তার পুত্র সৈয়দ ফজল পুক্কোয়া, এবং সৈয়দ সানা-উল্লাহ্-মাক্তি টঙ্গলেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা একটি জনপ্রিয় মতাদর্শগত ক্ষেত্রে নতুন করে শক্তি সঞ্চার করেন। সেক্ষেত্রে ধর্ম ও অর্থনৈতিক অভিযোগ মিলেমিশে গিয়ে প্রকাশ্য প্রতিরোধের মানসিকতা প্রস্তুত হয়। প্রতিরোধকারীদের জমায়েত হওয়ার জায়গা ছিল মসজিদ আর লক্ষ্য ছিল হিন্দু জন্মিরা, তাদের মন্দির এবং ব্রিটিশ কর্মচারীরা যারা জন্মিদের ত্রাতা ছিল। তিনটি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে। প্রথমটি ঘটে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মঞ্জেরিতে। দ্বিতীয়টি ঘটে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে কুলাথুরে। এই দুটি ঘটনাই দক্ষিণ মালাবারে ঘটেছিল। তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল উত্তর মালাবারের মাত্তান্নুর অঞ্চলে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। বিদ্রোহ দমন করার জন্য সশস্ত্র ব্রিটিশবাহিনী নামানো হয়। দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে প্রায় কুড়ি বছরের জন্য শান্তি ফিরে আসে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে মোপলারা আবার রুখে দাঁড়ায়, কিন্তু পরিণাম ছিল সেই একই (দ্রষ্টব্য ৪.২ অধ্যায়ে)।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের আগে ভারবর্ষে কিছু কিছু কৃষক বিদ্রোহে উপজাতীয়রা অংশ নিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং অনুপজাতীয় দালালদের আসার

পরে ঐসব উপজাতীয়দের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য এবং স্থানীয় সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বিপন্ন হয়। ভিলেরা থাকত পূর্বেকার মারাঠা অঞ্চলে খান্দেশ পর্বতের পাদদেশে। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ এই অঞ্চল অধিকার করে নেয়। ফলে বহিরাগতদের আগমন ঘটে এবং ভিলদের উপজাতীয় জীবন এলোমেলো হয়ে যায়। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশবাহিনী ভিলদের একটি বিদ্রোহ দমন করে। অবশ্য তাদেরকে শান্ত করার জন্য কিছু উপযুক্ত ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পরিস্থিতি একই রকম থাকে। শেষ পর্যন্ত রামোসী নেতা পুরন্ধরের উমাজী রাজেকে গ্রেফতার করে ফাঁসি দেওয়া হয়। স্থানীয় ক্ষমতার লড়াইয়ে ভিলদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আহ্মদনগর জেলার কোলিরা। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে কোলিরাও ব্রিটিশ কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে। কিন্তু খুব শীঘ্রই ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তাদের পদদলিত করে ফেলে। তবুও বিদ্রোহের বীজ থেকেই গিয়েছিল। ১৮৪৪–৪৬ খ্রিস্টাব্দে কোলিদের বিদ্রোহ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। স্থানীয় এক কোলি নেতা দুই বছর ধরে ব্রিটিশ কর্তৃত্বকে সাফল্যের সঙ্গে অস্বীকার করেছিল।[৮৩] ১৮৩১–৩২ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি উপজাতীয় বিদ্রোহ ঘটে। বিহার ও উড়িষ্যার ছোটনাগপুর ও সিংহভূম অঞ্চলের কোল উপজাতীয়রা সেই বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। শত শত বছর ধরে কোলরা এইসব অঞ্চলে স্বাধীনতা ভোগ করত। এবারে ব্রিটিশ শাসন সেসব এলাকায় ঢুকে নিজস্ব আইন প্রতিষ্ঠা করে। ফলে বংশ পরম্পরাগত উপজাতীয় প্রধানদের ক্ষমতা বিপন্ন হয়। ছোটনাগপুরের রাজা এদেরকে উৎখাত করে বেশি খাজনা পাওয়ার জন্য জমিজায়গা বহিরাগতদের কাছে ইজারা দিতে শুরু করেন। অনুপজাতীয়দের বসতি এবং বারে বারে মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কাছে জমি হস্তান্তরের ফলে কোলদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মহাজন ও ব্যবসায়ীদের সাধারণত "সুদ" বা বহিরাগত মনে করত এরা। সংশ্লিষ্ট কর্তাদের কাছে সুবিচার চেয়ে ব্যর্থ হয়েও কোলরা বিদ্রোহের পথে পা বাড়ায়। বিদ্রোহীরা বহিরাগতদের সম্পত্তির ওপরে আক্রমণ হানত, কিন্তু তাদের জীবনহানি ঘটাত না। অর্থাৎ লুটপাট ও আগুন লাগিয়ে দেওয়াই ছিল প্রতিবাদের সাধারণ রূপ। তাই মৃত্যুর ঘটনা প্রায় নগন্য ছিল। কিন্তু "বিদ্রোহের ফলে" ছোটনাগপুর থেকে "ব্রিটিশ রাজের কর্তৃত্ব কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মুছে যায়"।[৮৪] অশান্তি থামিয়ে শৃঙ্খলা ফেরাতে শেষে ব্রিটিশবাহিনীকে নামতে হয়েছিল।

এই আমলের সবচেয়ে ফলপ্রসু উপজাতীয় বিদ্রোহ বা আন্দোলন ছিল ১৮৫৫–৫৬ সালের সাঁওতাল হুল (বিদ্রোহ)। পূর্ব ভারতে কটক, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার বিভিন্ন জায়গায় সাঁওতালেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করত। ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে রাজমহল পাহাড়ের কাছে এসে তারা জঙ্গল পরিষ্কার করে নেয় ও জায়গাটির নাম দেয় দামিন-ই-কোহ্। সাঁওতালদের ক্রমশ একটি

Oiku - contractors

ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল। কেননা, উপজাতীয়দের জমিগুলিকে অ-সাঁওতালি জমিদার ও মহাজনদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্থানীয় পুলিশের এবং রেলপথ নির্মাণ কাজে কর্মরত ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের অত্যাচার। বহিরাগতদের সাঁওতালরা বলত ডিকু। এদের প্রবেশের ফলে সাঁওতালদের পরিচিত জীবনের ছন্দ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। হারানো ভিটেমাটি ফিরে পাওয়ার জন্য তারা বাধ্য হয়ে লড়াইয়ে নামে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সাঁওতালেরা জমিদার ও ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দেয়। কিন্তু কেউই তাদের সেই চরমপত্রে কর্ণপাত করে নি। তখন হাজার হাজার সাঁওতাল তীরধনুক নিয়ে সরাসরি বিদ্রোহে নেমে পড়ে। তাদের "তিন কুখ্যাত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে — জমিদার, মহাজন, ও ব্রিটিশ সরকার"।[৮৫] বিদ্রোহ দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভাগলপুর থেকে রাজমহল পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলে কোম্পানির শাসন কার্যত ভেঙে পড়ে। এতে সরকারি মহলে আতঙ্ক ছড়ায়। এমতাবস্থায় নিম্নবর্ণীয় অনুপজাতীয় কৃষকেরাও সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করত। এর ফলে বিদ্রোহের বিরুদ্ধে পাল্টা নৃশংস পদক্ষেপ নেওয়া হয়। নির্মমভাবে প্রতিহিংসার বশে একের পর এক সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। একটি হিসেবে দেখা গেছে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহীদের মধ্যে পনেরো থেকে কুড়ি হাজার সাঁওতালকে চূড়ান্তভাবে বিদ্রোহ দমনের আগেই মেরে ফেলা হয়।[৮৬] এরপর থেকে ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের ব্যাপারে অনেক বেশি সজাগ হয়ে ওঠে। সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে নিয়ে আলাদা করে একটি প্রশাসনিক বিভাগ তৈরি করা হয়। নাম দেওয়া হয় সাঁওতাল পরগণা। এই নামের মধ্য দিয়ে সাঁওতালদের বিশিষ্ট উপজাতীয় সংস্কৃতি ও সত্তাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

গোটা উপমহাদেশ জুড়ে আরও অনেক বিদ্রোহই ঘটেছিল, তবে উপরোক্ত কৃষক বিদ্রোহগুলি চোখে পড়ার মত। এসব বিদ্রোহের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নিয়ে কোন ধরনের সোজাসাপটা মতামত প্রকাশ করায় ঝুঁকি আছে। তবুও খুব বৃহদাকারে বলা যেতে পারে যে, ঔপনিবেশিক যুগে পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক সম্পর্কের কারণেই কৃষকদের অভিযোগ দেখা দেয়। বেদনার্ত কৃষকদের উদ্বেগ এইসব বিভিন্ন বিদ্রহের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক পর্বের আগের যুগে ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কোনরকমে গ্রাসাচ্ছাদন। রাষ্ট্র উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করত বটে, তবে কৃষকদের কাছে জীবননির্বাহের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকলে তাঁরা সচরাচর প্রতিবাদের পথে যেতেন না। মুঘল আমলে এব্যাপারে একটা বোঝাপড়া ছিল। (প্রথম অধ্যায়ে এবিষয়ে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে)। আঠারো শতকে সেই বোঝাপড়া ভেঙে যায়, কারণ উদ্বৃত্ত আদায় আগের চেয়ে জোরালো হয়ে ওঠে। এর ফলে কৃষকদের গ্রাসাচ্ছাদনে হাত পড়ে। পরিণামে বারে বারে ঘটে কৃষক বিদ্রোহ। ঔপনিবেশিক রাজস্ব ব্যবস্থা সেই প্রক্রিয়াকেই শক্তিশালী করে। তবে ঔপনিবেশিক কৃষি-অর্থনীতিতে ধারাবাহিকতা অপেক্ষা

পরিবর্তনই ছিল বেশি। এ বিষয়ে আমরা গত অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ঔপনিবেশিক শাসনের উদ্যোগই ছিল ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করে নেওয়া। কৃষিব্যবস্থাকে তাই ধনতান্ত্রিক করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, কৃষি সম্পর্কের ওপরে যার বিধ্বংসী প্রভাব পড়ে। জমির ওপরে সম্পত্তিগত অধিকার সৃষ্টি হয়। পরিণামে জমি হয়ে ওঠে বাজারি পণ্য। এরই ফলে প্রথাগত উৎপাদন সম্পর্ক দূরীভূত হয়ে যায়। চলে আসে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক। কৃষির বাণিজিকীকরণ বাড়তে থাকে। আস্তে আস্তে নজরানার পরিবর্তে উদ্বৃত্ত হিসেবে লভ্যাংশ আদায় হয়ে ওঠে প্রধান। কিন্তু এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি কখনই সম্পূর্ণ হয় নি, যেহেতু নজরানা ও লভ্যাংশ আদায় দুটিই পাশাপাশি বজায় ছিল। তার ফলে সমস্ত পরিচিত কৃষি সম্পর্কগুলিই আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ে।

রণজিৎ গুহর মতে ঔপনিবেশিক শাসনের পরিণামে "জমিদারি ব্যবস্থা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল"।[৮৭] সম্পত্তিগত সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটে যায়। কৃষকেরা তাদের প্রজাস্বত্ব অধিকার হারায়। তাদেরকে ইচ্ছামত উৎখাত করা যেত। অথাৎ তাদের সামাজিক মর্যাদায় বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার কৃষকদের প্রজাসত্বের বিষয়টি নিয়ে ভাবত না। সেই সংক্রান্ত অধিকারগুলি সংরক্ষণের চিন্তাও করত না। রাষ্ট্রের উচ্চাহরে ধার্য রাজস্বের চাপ গিয়ে কৃষকদের ঘাড়েই পড়ত। সেই সঙ্গে যুক্ত হত রাজস্ব আদায়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম এবং নির্দয় ব্যবহার। কৃষকদের দুর্দশা বাড়ত। ব্রিটিশ আইনে জমিদারদের কৃষক নিপীড়নের ক্ষমতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। জমিদারদের সামরিক ক্ষমতা কার্যত খর্ব করা হয় নি। বরং জমিদার-দারোগা, এই জুটির মাধ্যমে সেই ক্ষমতা প্রযুক্ত হতে থাকে। নতুন নতুন আদালত আর বিচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা জমিদারদের দণ্ডমূলক কর্তৃত্বকে বাড়িয়ে দেয়। জমিদারদের মনে করা হত নিপীড়নের হোতা, যারা রাষ্ট্রের দ্বারা সুরক্ষিত। কাজেই জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মানেই সেটা সহজেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হত। জমিদারেরা ধনতান্ত্রিক উদ্যোগের চাইতে বেশি উৎসাহী ছিল শোষণে কেননা, জমিদারেরাও রাষ্ট্র কর্তৃক উচ্চ রাজস্ব ধার্যের ও সূর্যাস্ত আইনের ক্রমাগত চাপের অধীনে থাকত। জমি বাজারি পণ্য হওয়ার ফলে জমি হস্তান্তরের হার বেড়ে যায় এবং যে, ঘটনাটি জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটিকে বাড়িয়ে তুলেছিল, তা হল ঋণদানের নতুন সম্পর্ক। উচ্চহারে রাজস্ব ধার্য হওয়ার ফলে কৃষকদের ধারে টাকা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এর ফলেই মহাজনদের এবং ব্যবসায়ীদের গ্রামীণ সমাজের ওপরে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বেড়ে যায়। কৃষকদের ঋণের বোঝা বাড়তে বাড়তে একটা সময়ে তারা জমি থেকে উৎখাত হয়ে যেত। সেই জমি চলে যেত অ-কৃষক শ্রেণীর হাতে। রণজিৎ গুহর ভাষায় জমিদারের, মহাজনেরা ও রাষ্ট্র এই তিনে মিলে "কৃষকদের ওপরে সংযুক্ত প্রাধান্য কায়েম করেছিল"।[৮৮]

উপজাতীয় কৃষকদের পীড়িত হওয়ার বিশেষ কতগুলি কারণ ছিল। এরা প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কৃষক সমাজের প্রান্তীয় এলাকায় বাস করত এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ভোগ করত স্বাতন্ত্র্য। একটি সার্বিক সমান অধিকারের নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের সমাজজীবন। কালে কালে তারা হিন্দু হয়ে ওঠে এবং জাতপাতের ক্রমবিন্যাসের নিপীড়নের চাপে পড়ে যায়। তার ওপরে ঘটে ব্রিটিশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিস্তার। ফলে উপজাতীয়দের স্বাতন্ত্র্য একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায়। উপজাতীয়দের জমিগুলি অত্যাচারের হোতা জমিদার ও মহাজনদের হাতে চলে যাওয়ায় তারা বৃহত্তর অর্থনৈতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এই সঙ্গে বনজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ আইন চালু করে তাদের স্বাভাবিক অধিকারে অনধিকার হস্তক্ষেপ করা হয়। অন্যভাবে বললে বলা যায়, ব্রিটিশ আইনের শাসন চাপিয়ে উপজাতীয়দের ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র ক্ষেত্রগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তাদের সেই কল্পিত স্বর্ণময় অতীত জীবনটিকে অনধিকারী বহিরাগতরা—সুদ ও ডিকুরা—ধ্বংস করে দেয়। এর ফলেই উপজাতীয়দের সহিংস বিস্ফোরণ ঘটে।

ঔপনিবেশিক পর্বের প্রথম দিককার এইসব কৃষক ও উপজাতীয়দের বিদ্রোহগুলিকে বিভিন্নভাবে ভাবা হয়েছে। ব্রিটিশ প্রশাসন এসবকে আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা বলে মনে করত। মনে করা হত এসব উপজাতীয়রা সভ্যতাবিরোধী অসভ্য আদিম প্রবৃত্তির। জাতীয়তাবাদীরা পরবর্তীকালে তাদের ঔপনিবেশিক সরকার-বিরোধী সংগ্রামের স্বার্থে এই সব কৃষক ও উপজাতীয়দের ইতিহাসকে আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করে এবং সেসব আন্দোলনকে আধুনিক জাতীয়তাবাদের প্রাক্-ইতিহাস হিসেবে তুলে ধরে। ঐতিহাসিক এরিক স্টোক্স্ বলতেন এগুলি হল "প্রাথমিক প্রতিরোধ, অর্থাৎ পরম্পরাগত সমাজের হিংসাশ্রয়ী প্রতিবাদমূলক কাজ, এরই পরিণতিতে ঔপনিবেশিক শাসন চাপানো হয়"।[৮৯] ডি.এন. ধনাগারের মত ঐতিহাসিকেরা বলেন এই কৃষক বিদ্রোহগুলি ছিল "প্রাক্-রাজনৈতিক," কারণ সেসব বিদ্রোহে কোন সংগঠন, কর্মসূচী অথবা মতাদর্শ ছিল না।[৯০] অন্যদিকে রণজিৎ গুহ বলেছেন "গ্রামের সাধারণ মানুষের জঙ্গি আন্দোলনের মধ্যে অরাজনৈতিক কিছুই ছিল না"।[৯১]

উপরোক্ত বিদ্রোহগুলি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একেবারেই ছিল না। কৃষকদের বিদ্রোহগুলি ছিল তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। যদিও ভিন্ন পথে, তবুও এসব বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই কৃষক সম্প্রদায়ের রাজনীতি-সচেতনতাই প্রকাশ পেত। রণজিৎ গুহ দেখিয়েছেন (১৯৯৪ খ্রিঃ) যে, কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে নানারকম সম্পর্ক সম্বন্ধে কৃষকদের পরিষ্কার ধারণা ছিল। কর্তৃত্বের সেই কাঠামোটিকে উল্টিয়ে দেওয়ার সঙ্কল্পও তাদের ছিল। বিদ্রোহীরা অত্যাচারের রাজনৈতিক মূল উৎসগুলি সম্বন্ধে সজাগ ছিল। এটাই তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত—জমিদারের বাড়ি ও তাদের শস্যাগার, মহাজন, ব্যবসায়ী এবং শেষমেশ ব্রিটিশের রাষ্ট্রযন্ত্র। কেননা, ব্রিটিশেরা

তাদের প্রশাসনিক সহযোগিতা নিয়ে অত্যাচারের স্থানীয় দালালদের রক্ষায় এগিয়ে আসে। বিদ্রোহীরা তাদের বন্ধুদের চিনে নেবার পাশাপাশি শত্রুদেরও চিহ্নিত করতে পেরেছিল। এইসব বিদ্রোহের মধ্যে আমরা প্রায়ই একটা জিনিস খুঁজে পাই। সেটা হল প্রাধান্যকারী শ্রেণীর ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিপীড়িতের সম্পর্কের পরিবর্তন, যদিও বিদ্রোহীদের প্রতিবাদ ছিল বহুরূপী। বিদ্রোহ ছিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, কোন অপরাধ নয়, কেননা বিদ্রোহ ঘটত প্রকাশ্যে, খোলাখুলিভাবে। সাঁওতালেরা যথেষ্ট আগে থেকেই সতর্ক করে দিত। রঙপুরের নেতারা বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে কৃষক সম্প্রদায়ের ওপরে কর বসিয়েছিল। প্রকাশ্যে সভা, সমিতি, জমায়েত ও পরিকল্পনা হত। এথেকে বোঝা যায় তাদের একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচী নিশ্চয়ই থাকত। বিদ্রোহীদের সমারোহপূর্ণ অভিযান হত। সাঁওতালদের বিদ্রোহ ছিল তাদের সম্মিলিত শ্রম, যেহেতু তারা মনে করত বিদ্রোহ ছিল তাদের পরম্পরাগত শিকারমূলক কাজেরই সামিল। তবে এই বিদ্রোহে তাদের সেই শিকারী মানসিকতার একটি নতুন রাজনৈতিক অর্থ সৃষ্টি হয়ে ছিল।

এইসব কৃষক বিদ্রোহের নেতা বিদ্রোহীদের মধ্য থেকেই স্থির হত। যেহেতু নেতারা কৃষক ও উপজাতীয় সংস্কৃতিমনস্ক হত, তাই তারা উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করতে পারত। কৃষকদের সমাবেশ ঘটত সম্প্রদায়কে করেই। ব্যতিক্রম ছিল রঙপুর বিদ্রোহ। ঔপনিবেশিক আমলে গ্রামীণ সমাজে নানারকম টানাপোড়েন থাকত—শ্রেণীগত, জাতিগত, ধর্মীয় গোষ্ঠীগত। গ্রামে গ্রামে অত্যাচার আর দারিদ্র্যের কারণে এইসব উত্তেজনা হিংসাশ্রয়ী হয়ে প্রকাশ পেত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্রতর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ধর্মই বন্ধন রচনা করত। আর নেতারা অতিপ্রাকৃত উপায়ে তাদেরকে নতুন যুগের ভোরে পৌছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিত।[৯২] প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে সচেতনতা উন্নত ছিল না, সেখানে ধর্মই বিদ্রোহের মতাদর্শ যোগাত। বিদ্রোহীরা তাদের নেতাদের পবিত্র মনে করত। সেই পবিত্র নেতারা নৈতিক যুগের অবসানের কথা বলতেন এবং রূপকের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বেগের কথা প্রকাশ করতেন। এইভাবেই ধর্ম তাদের আন্দোলনকে বৈধ করে তুলত। নিপীড়িত শ্রেণীর ভবিষ্যৎ-কল্যাণকর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতিদাতা জননায়কদের ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী মনে করা হত। তাদের ক্ষমতাপ্রয়োগকে মনে করা হত ঈশ্বরের কাজ। এইভাবেই তাদের বিদ্রোহ বিধিনির্দিষ্ট হত এবং উচ্চতর কোন কর্তৃত্বের সাপক্ষে বৈধ হত। এটি কৃষকদের মতাদর্শের কাজ করত। তাদেরকে প্রেরণা জোগাত। এইসব কৃষক বিদ্রোহ আধুনিক জাতীয়তাবাদের চাইতে আলাদা ছিল। বিদ্রোহীদের জাতিগত অবস্থান ও সীমা সম্বন্ধে ধারণা অনুযায়ী বিদ্রোহের বিস্তার ঘটত। বিদ্রোহী সম্প্রদায় যে-ভৌগোলিক অঞ্চলে বাস করত এবং কাজ করত, সেই অঞ্চলেই বিদ্রোহ সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হত। যেমন সাঁওতালদের সংগ্রাম ছিল 'পিতৃভূমি'র জন্য। তবে কখনও কখনও জাতিগত বন্ধন ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে

যেত। যেমন কোল বিদ্রোহ। একই সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের কোলরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। সময় সম্বন্ধে বিদ্রোহীদের নিজস্ব ধারণারও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকত। ইতিহাসে একটা ধারণার প্রায়ই উদ্ভব ঘটে। সেটা হল সুদূর অতীতে এক "স্বর্ণযুগ" ছিল।[৯৩] সেই কল্পিত স্বর্ণযুগকে ফিরিয়ে আনার তাগিদই কৃষকদেরকে মতাদর্শগত প্রেরণা জোগাত। ফারাজী ও সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল তার আদর্শ উদাহরণ।

উপরোক্ত সশস্ত্র ও অসংঠিত বিদ্রোহগুলি ছাড়াও সামাজিক দস্যুবৃত্তি, "আইন-শৃঙ্খলাহীনতা" ইত্যাদি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে একেবারে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছিল। সহযোগিতা আর বিদ্রোহের মধ্যে সীমানা প্রায় ছিলই না, কারণ যারা সহযোগিতা করতেন তাদের মনেও বিদেশী শাসকদের প্রতি একটা অপছন্দ ও ঘৃণার ভাব থাকত। যেমন কলকাতার ভদ্রলোকদের কথা ধরা যাক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ওপর তাদের আস্থা ছিল। কৃষক বিদ্রোহকে তারা প্রবল উৎসাহে সমালোচনা করত। সেই হেন ভদ্রলোকেরাও বলেছিল অনুগত সাঁওতালেরা বিনা কারণে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেনি।[৯৪] কৃষক সম্প্রদায়ের মত শহরে সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর মানুষেরাও তাদের প্রতিবাদে সমানভাবে সুসংবদ্ধ ছিল। ১৮৩৩–৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দিল্লি ও পশ্চিম হিন্দুস্তানে শস্য নিয়ে দাঙ্গা বাধে। এবং শস্য ব্যবসায়ীদের একাধিপত্যের ও মধ্যস্থতাকারী ব্রিটিশ কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। ভেলোরে চাল নিয়ে দাঙ্গা হয়ে ছিল। ১৮০৬ থেকে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরকরণের হুমকির বিরুদ্ধেও দাঙ্গা হয়েছিল। অবাধ বাণিজ্যের চাপে হস্তশিল্প আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যায়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে তাই নিয়ে কলকাতাতে হস্তশিল্পীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একই সমস্যা নিয়ে সুরাটে বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৭৯০-এর দশকে এবং ১৮০০ অব্দে। ১৮০৯ থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রোহিলখণ্ড ও বারাণসীতেও হস্তশিল্পীদের বিদ্রোহ দেখা দেয়। এইসব বিদ্রোহ যে সবসময়ে সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী হত, তা নয়। তবে ঔপনিবেশিক শাসনের নীতি ও শর্তাদির সঙ্গে এসব বিদ্রোহের সম্পর্ক থাকত।[৯৫] তবে ভারতে কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সম্ভাবনার দিক দিয়ে সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রতিরোধ ছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ।

## ৩.৩ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ও মধ্য ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়, যার ফলে সেসব অঞ্চলে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন ভেঙে পড়ে। সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর সাহায্যে শাসন-শৃঙ্খলা আবার ফিরিয়ে আনা হয়। কোম্পানি ও বিদ্রোহী উভয় তরফেই ব্যাপক হিংসার আশ্রয় নেওয়া হয়। ব্রিটিশ শাসন যেমন "সতর্কভাবে হিংসার একাধিপত্য গড়ে তোল," তেমনি

এদেশীয়রাও সেই হিংসার সমুচিত জবাব পাল্টা হিংসার মধ্য দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশরা যদি বিদ্রোহের বিরুদ্ধে দমনমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যে ফাঁসি দিত, কামান দিয়ে উড়িয়ে দিত অথবা গ্রামের পর গ্রাম নির্বিচারে পুড়িয়ে দিত, তবে বিদ্রোহীরাও নির্দয়ভাবে স্ত্রী ও শিশুসহ সাদা চামড়ার অসামরিক মানুষদের ধ্বংস করে দিত। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন তারিখের কানপুর হত্যাকাণ্ড ঔপনিবেশিক শাসনাধীন এদেশীয়দের হিংসাশ্রয়ী ঘটনার মধ্যে "সীমালঙ্ঘনকারী" ঘটনা যেটি উপনিবেশকারীদের হিংসার একাধিপত্যকে ভেঙে দেয়।[৯৬] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পরে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে সংসদীয় আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ রাজ ভারতীয় সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার নিয়ে নেয়। যেহেতু বেঙ্গল আর্মির সেনারাই এই বিদ্রোহ শুরু করে, সেহেতু অনেকদিন পর্যন্ত একে শুধু সিপাহী বিদ্রোহই বলা হত। কিন্তু এই বিদ্রোহে উত্তর ভারতের দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামীণ সমাজও যোগ দিয়েছিল। বিদ্রোহের কারণ তাই শুধুমাত্র সেনাদের অসন্তোষের মধ্যে খুঁজলে হবে না, বরং বহুদিন ধরে ঘটমান মৌলিক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটিকে বোঝা দরকার। কারণ সেই প্রক্রিয়াটিই কোম্পানির শাসনের প্রথম শতকে কৃষক সম্প্রদায়কে বিপর্যস্ত করেছিল।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কোম্পানি তার নিজস্ব সেনাবাহিনী গড়ে তোলে। সেই সময় কোম্পানি এদেশীয়দের ঐতিহ্য, প্রথাপ্রকরণ এবং সেনাদের উচ্চজাতিগত পরিচয়কে ইচ্ছা করেই উৎসাহ দিত: বেঙ্গল আর্মিতে এটি বিশেষ করে ঘটত। কেননা বাংলার সেনাদের আগে থেকেই একটি উচ্চবর্ণীয় চরিত্র ছিল। যেহেতু বাংলা দলে ছিল ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও ভূমিহারেরা। ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশ অনুযায়ী এদের খাওয়া-দাওয়া, স্থানান্তরে যাওয়া এবং জাতিগত নিয়মকানুনগুলি অত্যন্ত সচেতনভাবে সেনা-প্রশাসন মেনে চলত। যাহোক, ১৮২০-র দশক থেকে পরিবর্তন শুরু হয়। আরও বেশি করে সর্বজনীন সামরিক সংস্কৃতি চালু করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীতে সংস্কারসাধন শুরু হয়। ১৮২০-র এবং ১৮৩০-এর দশকে সেনা প্রশাসনের ওপরে অধিকতর শক্ত নিয়ন্ত্রণ চাপানোর চেষ্টা হয়। স্বাভাবিকভাবেই জাতিগত সুযোগ-সুবিধা ছাঁটতে শুরু করা হয়। প্রতিরোধও শুরু হয়ে যায়। চলে ১৮৪০-এর দশক পর্যন্ত (সেনাবাহিনী নিয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ২.৪ অধ্যায়)। এইসব ঘটনাই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পটভূমি তৈরি করে। ঐ বছরের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে প্রথম বিদ্রোহের সঙ্কেত পাওয়া গিয়েছিল। কলকাতার কাছে দমদমে সিপাহীদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে যায় যে পুরানো 'ব্রাউন বেস' গাদাবন্দুকের পরিবর্ত নতুন অস্ত্র এনফিল্ড রাইফেলের টোটাগুলি গরু ও শূকরের চর্বি মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে। রাইফেলে ভরার আগে টোটার একটি অংশ দাঁত দিয়ে কেটে নিতে হত। এতে সিপাহীরা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তাদের ধর্ম ও জাতকে ষড়যন্ত্র করে ধ্বংস করা হচ্ছে। এবং তাদেরকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত

করা হবে। টোটার গুজবটি পুরোপুরি সত্যরহিত নয়। গুজবটি দাবানলের মত দেশের সব সেনাছাউনিতে ছড়িয়ে পড়ে। ঐসব টোটার উৎপাদন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সিপাহীদের ভয় কাটাবার জন্য অনেকরকম সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হয়। কিন্তু যে বিশ্বাস একবার ভেঙে গিয়েছিল, সেটি আর কখনই ফিরে আসেনি। ২৯ মার্চ কলকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক সিপাহী উর্দ্ধতন এক ইয়োরোপীয় সেনা আধিকারিককে গুলি করে হত্যা করে। অন্যান্য উর্দ্ধতন ইয়োরোপীয় সেনা আধিকারিকদের আদেশ সত্ত্বেও পাণ্ডের সহকর্মীরা তাঁকে গ্রেফতার করেনি। শ্রীঘ্রই অবশ্য তারা ধরা পড়ে। সামরিক আদালতে তাদের বিচার হয়। এপ্রিল মাসের গোড়াতেই তাদের ফাঁসি হয়ে যায়। কিন্তু সিপাহীদের অসন্তোষকে কমানো যায়নি। পরবর্তী দিনগুলিতে দেশের বিভিন্ন সেনাছাউনি থেকে —আম্বালা, লখনউ, মীরাট— নানারকম অবাধ্যতা, হিংসাত্মক ঘটনা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার খবর আসতে থাকে। শেষে মে মাসের ১০ তারিখে মীরাটে সেনারাই বিদ্রোহ শুরু করে। তারা প্রথমে তাদের বন্দী হওয়া সহকর্মীদের মুক্ত করে, যারা নতুন টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছিল। এরপর তাদের ইয়োরোপীয় আধিকারিকদের মেরে ফেলে ও দিল্লি অভিমুখে রওনা হয়, সেখানে ১১ মে তারা মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে হিন্দুস্তানের সম্রাট বলে ঘোষণা করে।[৯৭] দিল্লি থেকে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে যায় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সেনাছাউনিতে, অযোধ্যায়, এবং অচিরেই গণবিদ্রোহের রূপ নেয়, যেহেতু অসন্তুষ্ট গ্রামীণ জনসাধারণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯ জুন বিষণ্ণ মনে গর্ভনর জেনারেল লর্ড ক্যানিং লিখলেন, "রোহিলখণ্ডে ও দোয়াব অঞ্চলে দিল্লি থেকে কানপুর এবং এলাহাবাদ পর্যন্ত গোটা দেশ শুধুমাত্র আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীই নয়, চূড়ান্তভাবে আইনশৃঙ্খলাহীন হয়ে উঠেছে"।[৯৮]

বিদ্রোহে বেঙ্গল আর্মির সেনাদলই প্রধানত প্রভাবিত হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বাহিনী চুপচাপ ছিল। অন্যদিকে পাঞ্জাবি ও গুর্খা সেনারা কার্যত বিদ্রোহ দমন করতে সাহায্য করেছিল। তবে মনে রাখা দরকার অধিকাংশ ভারতীয় সিপাহী ছিল বাংলা দলে। আমরা যদি গোটা সংখ্যাটার দিকে লক্ষ্য রাখি, তাহলে দেখা যাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় সিপাহীদের প্রায় অর্ধাংশ বিদ্রোহ করেছিল।[৯৯] গঠনগত দিক থেকেও বাংলার বাহিনীতে ত্রুটি ছিল। কেননা সেখানে সামান্যই ব্রিটিশ সামরিক উপস্থিতি থাকত। পরবর্তীকালে একেই সবচেয়ে বড় ত্রুটি বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। অধিকন্তু বাংলার বাহিনীতে বেশির ভাগই অযোধ্যা থেকে নিয়োগ করা হত এবং তাদের উচ্চবর্ণীয় চরিত্র বজায় রাখা হত। এর ফলে বাংলার সেনাদলের একটা সমজাতীয় চরিত্র বজায় থাকত। দীর্ঘদিন ধরে তাদের অনেক অভিযোগ ছিল। তাদের চাকরির নতুন শর্তাদির সঙ্গে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সংঘর্ষ বাধে। তাদের বেতনের স্তর নেমে যায়। পদোন্নতি ও অবসরকালীন সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয় তারা। সর্বোপরি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কোম্পানি চাকরি সংক্রান্ত নতুন

বিধিব্যবস্থা চালু করে। সেই বিধিতে বলা হয় যে কর্মীদের নিজেদের অঞ্চলের বাইরে গিয়েও কাজ করতে হবে, কিন্তু তার জন্য কোন ভাতা তারা পাবে না। বিদেশে গিয়ে চাকরি করা সেনাদের কাছে জাতিগত সংস্কারবিরোধী মনে হত। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারের প্রেক্ষিতে ভিনদেশে চাকরি করতে যাওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। এদেশীয়রা বর্মা, সিন্ধু বা আফগানিস্তানে যেতে রাজি না হলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হত, কখনও কখনও বরখাস্তও করা হত।

চাকরির শর্তাদি নিয়ে এরকম অশান্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটা ভয়। সিপাহীরা মনে করত ব্রিটিশরা তাদেরকে জোর করে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করে দেবে। খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের উপস্থিতি, ময়দায় মেশানো গরু ও শূকরের হাড়ের গুঁড়ো বিষয়ক গুজব এবং এনফিল্ড রাইফেলের টোটা নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদি একত্রে সুচারুভাবে একটি ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করে দেয়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ অযোধ্যা অধিকার করে নেয়। এর বিশেষ বিরূপ প্রভাব পড়েছিল বেঙ্গল আর্মির সেনাদের মানসিকতার ওপরে, কারণ অযোধ্যা থেকেই প্রায় ৭৫০০০ সেনা এই বিভাগে নিয়োগ করা হয়। আগেই স্যার জেমস উটরাম ডালহৌসিকে সতর্ক করে লিখেছিলেন, "অযোধ্যার প্রত্যেকটি কৃষক পরিবার থেকে, হয়তো বা কেউই বাদ নেই, একজন করে ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছে"।[১০০] অযোধ্যার অন্তর্ভুক্তি এইসব সিপাহীদের আনুগত্যে আঘাত হেনেছিল। তাদের কাছে এই ঘটনা ছিল ব্রিটিশের অবিশ্বাসযোগ্যতার চূড়ান্ত প্রমাণ। অধিকন্তু সিপাহীরা ছিল আসলে উর্দিপরা কৃষক। অযোধ্যায় এক কঠোর রাজস্ব ব্যবস্থা চালু হওয়ায় কৃষির অবনতি ঘটে। কৃষক মনোভাবাপন্ন সিপাহীরা কৃষির এই অবনতির বিষয়েও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিল। এরকম রাজস্ব ব্যবস্থার কারণে আযোধ্যায় য়ে কষ্টকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিষয়ে ব্রিটিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সিপাহীদের তরফ থেকে প্রায় ১৪ হাজার আবেদন জমা পড়ে।[১০১] অর্থাৎ শুধুমাত্র "টোটার" কারণেই সিপাহীরা কোমর বেঁধে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহে নামেনি।

সিপাহীদের বিদ্রোহের সঙ্গে যে-বেসামরিক বিদ্রোহ ঘটেছিল, তাকে ব্যাখ্যা করা অনেক বেশি কঠিন। ভারতীয় সমাজে ঔপনিবেশিক শাসনের নানারকম প্রভাব পড়েছিল। সেই অনুযায়ী ভারতীয় সমাজের প্রতিক্রিয়াও বিভিন্নরকম ছিল। সবার আগেই বলা দরকার যে-সব অঞ্চল ঔপনিবেশিক শাসনের প্রসাদ পেত, তারা বিদ্রোহে নামেনি। যেমন বাংলা ও পাঞ্জাব শান্তিপূর্ণ ছিল। গোটা দক্ষিণ ভারত এর প্রভাবের বাইরে ছিল। পক্ষান্তরে যারা বিদ্রোহ করেছিল, তাদের মধ্যে দুটি উপাদান ছিল—একদিকে ছিল সামন্তপ্রভু ও বড় জমিদার আর অন্যদিকে ছিল কৃষক সম্প্রদায়। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন রকম অভিযোগ ছিল। আবার অঞ্চলে অঞ্চলেও অভিযোগের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হত। সামন্তপ্রভুদের অভিযোগের তীর ছিল ডালহৌসির 'স্বত্তবিলোপ' নীতির দিকে। কেননা ওই নীতি অনুযায়ী উত্তরাধিকারী হিসেবে দত্তক পুত্র নেওয়া

বন্ধ হয়ে যায় এবং ওইসব রাজ্যগুলি কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। এইভাবেই সাতারা (১৮৪৮), নাগপুর, সম্বলপুর, বাঘাট (১৮৫০), উদয়পুর (১৮৫২) এবং ঝাঁসি (১৮৫৩) খুব তড়িঘড়ি অধিকার করে নেওয়া হয়। এর ফলে ভারতবর্ষের পরম্পরাগত উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় ব্রিটিশের হস্তক্ষেপ ঘটে। এর পরিণামে সামন্তপ্রভুরা অসন্তুষ্ট হয়। বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মেলায়। শেষে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যা অধিকার করে নেওয়া হয় এবং অযোধ্যার নবাবকে কলকাতায় সরিয়ে দেওয়া হয়। এই অধিগ্রহণের ফলে শুধুমাত্র নবাব ও তাঁর পরিবারই ক্ষতিগ্রস্ত হননি, রাজদরবারে সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত অভিজাতরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সিংহাসনচ্যুত রাজারা নিজ নিজ অঞ্চলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতেন। এইভাবেই তাঁরা বিদ্রোহকে বৈধ করে তোলেন। যেমন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানা সাহেব কানপুরে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। লখনউতে বেগম হজরৎমহল রোহিলখণ্ডে খান বাহাদুর খান আর ঝাঁসিতে সিপাহীদের নেত্রী ছিলেন রানী লক্ষ্মীবাঈ। যদিও রানী কিছুদিন আগেও ব্রিটিশের প্রভুত্বকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন, যদি ব্রিটিশ তাঁর দত্তকপুত্রকে ঝাঁসির সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকার করত। মধ্য ভারতে অন্যান্য জায়গায় যেমন ইন্দোর, গোয়ালিয়র, সৌগার বা রাজস্থানের কিছু অঞ্চলে এরকম সিংহাসনচ্যুতির ঘটনা ঘটেনি। সেখানে সিপাহীদের বিদ্রোহ করেছে কিন্তু রাজপরিবারগুলি ব্রিটিশের প্রতি অনুগতই থেকে গেছে।

গ্রামীণ সমাজে বড় জমিদার বা তালুকদারেরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মেলায়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যা অধিকারের পর সেখানে কড়ারকমের রাজস্ব ব্যবস্থা চালু হয়। এরফলে বহু শক্তিশালী তালুকদারদের সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যায়। রাজস্ব ব্যবস্থাটি প্রকৃতপক্ষে জমির অধিকারীদের সঙ্গে অথবা গ্রামের সহউত্তরাধিকারীদের সঙ্গে করা হত। অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তিগত অধিকারকে উপেক্ষা করে কিছুদিন আগে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কৃষক সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করা। আর সরকার ও কৃষকদের মধ্যের অবাঞ্ছিত মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া। ফলে অযোধ্যায় তালুকদারেরা তাদের সম্পত্তির প্রায় অর্ধেক হারিয়েছিল। তাদের নিরস্ত্র করা হয় ও তাদের দুর্গগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে স্থানীয় সমাজে তাদের মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রভূত ক্ষতি হয়। আইনের চোখে তাদের সঙ্গে তাদের দীনতম প্রজাদের কোন পার্থক্য আর রইল না।[১০২] কাজেই জমিদারদের অসন্তোষে অযোধ্যা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও তথৈবচ। সেখানেও অসংখ্য তালুকদারদের সম্পত্তির বিনাশ হয়। বিদ্রোহ শুরু হতেই এইসব তালুকদারেরা সেইসব গ্রামে ঢুকে পড়ে যেগুলি তারা হারিয়েছিল। অত্যন্ত তাৎপর্যময় বিষয় হল, তারা তাদের প্রজাদের তরফ থেকে কোনরকম বাধার সম্মুখীন হয়নি। টমাস মেটকাফ দেখিয়েছেন যে, আত্মীয়তা ও সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্যের

বন্ধনে আবদ্ধ গ্রামবাসীরা তাদের সামন্তপ্রভুদের দাবি খুশিমনেই স্বীকার করে নিয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে সাধারণ শত্রু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হাত মেলায়।[১০৩]

কৃষকেরা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল কারণ রাষ্ট্রের অত্যন্ত উচ্চহারে রাজস্ব আদায়ের চাপে তারাও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যেমন ধরা যাক অযোধ্যার কথা। সেখানে নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণ মোটের ওপর কমিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েকটি অঞ্চলে অতিরিক্ত উচ্চহার বহাল থাকে এবং সেখানে তালুকদারদের সম্পত্তি নাশ হওয়ার ফলে "তালুকদার-কৃষক জোট" দানা বাঁধে নিজ নিজ স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে।[১০৪] একই পরিস্থিতি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও ছিল। সেখানে মহলওয়ারি ব্যবস্থা গ্রামের মালগুজারদের সঙ্গে করা হয়। এইসব মালগুজারদের উপকারের জন্যই এই নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু উচ্চরাজস্ব ধার্যের কারণে এরাও মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। অতিরিক্ত রাজস্বের বোঝা কৃষক-মালিকদের ঘাড়েই বেশি করে চেপেছিল, কর গ্রহণকারী জমিদার বা অন্যান্যদের তুলনায়। জমি সংক্রান্ত অধিকারগুলির সরাসরি বিক্রীর বহর থেকেই এই অতিরিক্ত চাপের আন্দাজ পাওয়া যায়। এটাই ছিল বিদ্রোহের একটা বড় কারণ। কৃষিই যেখানে অনিশ্চিত, সেখানে উচ্চহারে রাজস্ব ধার্য করার ফলে কৃষকেরা অনিবার্যভাবে দেনায় ডুবে যায়। সম্পত্তি হারায়। নতুন আদালত ও আইনি ব্যবস্থাও এই প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করে।[১০৫] ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেই ১,১০,০০০ একর জমি নিলামে বিক্রী হয়ে যায়। কাজেই বিদ্রোহ শুরু হলে দাঙ্গাকারী কৃষকেরা বানিয়া, মহাজন ও তাদের সম্পত্তির ওপর হামলা চালায়। এস.বি. চৌধুরী এই পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, জমি বিক্রীর ফলে শুধুমাত্র সাধারণ লোক জমি থেকে উৎখাত হয়নি দেশের ভূম্যধিকারীরাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এবং উভয়পক্ষই ব্রিটিশ আইনের শিকার হওয়ায় ১৮৫৭–৭৮ খ্রিস্টাব্দের বৈপ্লবিককালে মিলিত হয়েছিল তাদের হারানো সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার চেষ্টায়।[১০৬]

গল্পটা অবশ্য ততটা সোজাসাপটা নয়। এরিক স্টোক্স্ (১৯৮০) পরিস্থিতির জটিলতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মনে রাখতে হবে যে সব তালুকদারেরাই ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যবস্থার কারণে দুর্দশায় পড়েনি। অনেক জায়গাতে সম্পত্তির অধিকার পরম্পাগত জমিদার জাতিগুলির মধ্যেই হাত বদল হতে থাকে। কোথাও ক্ষয়িষ্ণু জাতি থেকে উদ্ভূত হয় নতুন বড় জমিদার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকজনরা তাদের সরকারি পদের সুযোগ নিত। এইসব সফল তালুকদারদের স্টোক্স্ বলেছেন "নতুন জমিদার"। এরা অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে উভয় জায়গাতেই চলতি পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল। এরা বিদ্রোহ তো করেইনি, বরং নিজ নিজ সম্প্রদায়কে শান্ত করে রাখার কাজে তৎপর ছিল। আবার সব কৃষকেরাই দুর্দশার কবলে পড়েনি। যেসব কৃষকেরা অপেক্ষাকৃত বেশি জলসেচনের সুবিধাযুক্ত উর্বর এলাকায় থাকত, তারা অতিরিক্ত রাজস্বের বোঝা বইতে পারত।

কিন্তু যারা অনুন্নত এলাকায় থাকত, তারা তা পারত না। অনুন্নত এলাকাগুলিতে বঞ্চনার ধারণাটিও ছিল আপেক্ষিক। এটা ছিল অশান্তির প্রধান কারণ। যখন কিছু কৃষক চাপে পড়ে পিষ্ট হত তখন তারা এটা কিছুতেই সহজভাবে মানতে পারত না যে, তাদেরই জাত ভাইয়েরা পার্শ্ববর্তী এলারকায় খালের জলসেচের সাহায্যে বাণিজ্যিক শস্য চাষ করে লাভ করছে।

অনুন্নত এলাকাতে কৃষকেরা সহজেই সুদখোর বা মহাজনদের চাপের মুখে পড়ত এবং জমি হারাবার সম্ভাবনাও থাকত। তবুও ঋণের সঙ্গে বিদ্রোহের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। বস্তুত স্টোক্‌স্ ঋণ আর বিদ্রোহের মধ্যে উল্টো সম্পর্কের কথাই বলেছেন। উচ্চ রাজস্বের বোঝাযুক্ত শুষ্ক জমির আকর্ষণ মহাজন বা বহিরাগত বানিয়াদের কাছে কতটা ছিল বলা কঠিন। তারা সেইসব জমিরই দখল নিতেন যেখানে বাণিজ্যিক চাষের বিস্তার ঘটেছিল। সেখানেও আবার কার্যত জমি হারাবার ব্যাপারটা খুব কমই ঘটত। কেননা, উদ্দেশ্যটা সেখানে ছিল রাজনৈতিক; অর্থাৎ জমি অপেক্ষা উৎপাদক কৃষকদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। কাজেই অনুন্নত এলাকায় ও "তৃষ্ণার্ত" এলাকায় যেখানে রাজস্ব ধার্য হত বেশি সেইসব অঞ্চলে মহাজনদের প্রবেশ ছিল সবচেয়ে কম। বিদ্রোহ চলাকালীন সেইসব অঞ্চলই ছিল সবচেয়ে বেশি হিংসাপ্রবণ। যেখানে জাতি-ভ্রাতৃত্ব বা ভাইয়াচারা শক্তিশালী থাকত, সেখানে মহাজনদের চাপ ভালভাবেই রুখে দেওয়া যেত। এবং সামাজিক একতা আর সমষ্টিগত শক্তি মিলিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব জাগিয়ে তুলত বা বিদ্রোহী মনোভাবকে উস্কে দিত।

গুজর বা জাঠদের মধ্যে, রাজপুত বা সৈয়দদের মধ্যে সম্প্রদায়ভিত্তিক ঐক্য কৃষক বিদ্রোহের কার্যকারিতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গ্রামীণ সমাজের সর্বস্তরে সাধারণভাবেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সন্দেহ ছিল; ব্রিটিশরা তাদের ধর্মের সর্বনাশ করবে এমন সন্দেহও ছিল। সাম্প্রতিক কালের সামাজিক সংস্কারগুলির কারণেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এই ধরনের সন্দেহ দানা বাঁধে। আর খ্রিস্টধর্মপ্রচারকেরা সরাসরি সেই সন্দেহকে জোরদার করে। হিন্দু ও মুসলমানরা সকলেই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাই বিদ্রোহ চলাকালীন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বরাবর বজায় ছিল। উত্তর ভারতে কৃষিপ্রধান সমাজে হিংসাশ্রয়ী প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়ার ব্যাখ্যা কোন একটি কারণ দিয়ে করা যায় না। সি.এ. বেইলি লিখছেন যে এরিক স্টোক্‌স্ নির্দিষ্টভাবেই দেখিয়েছেন যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় বিদ্রোহ একক ছিল না, এই বিদ্রোহে অনেক বিদ্রোহের সমাবেশ ঘটেছিল"।[১০৭]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ সম্পর্কে আরেকটি বিতর্কিত বিষয় হল এর চরিত্র। যবে থেকে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে, তবে থেকেই এর চরিত্র নিয়ে তর্ক রয়েছে। সমসাময়িক কেউ কেউ বলেছেন এই বিদ্রোহ ছিল মুঘল মুসলমানী ষড়যন্ত্র। তবে এই ধারণার সত্যতার পক্ষে তেমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। অপেক্ষাকৃত বেশি

প্রাধান্যকারী সরকারি ভাষ্য মতে এটি ছিল প্রধানত সিপাহীদের বিদ্রোহ। অসামরিক লোকেদের অসন্তোষ ছিল অপ্রধান ঘটনা যা ঘটেছিল কারণ কিছু আইন লঙ্ঘনকারী আইন-শৃঙ্খলার অবনতির সুযোগ নিয়েছিল। এস. এ. সেনের মত পরবর্তীকালের ভারতীয় ঐতিহাসিকেরাও বিদ্রোহের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে একই ঔপনিবেশিক যুক্তি মেনে নিয়ে এর চরিত্র নির্ধারণ করেছেন। সেন বলেছেন যে, বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল সেনাদের নিয়ে। যখন শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, তখন বেআইনি লোকেদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়"।[১০৮] আর.সি. মজুমদারের ধারণাও একই। তিনি বলছেন "প্রথমে যা শুরু হয়েছিল বিদ্রোহ হিসেবে, পরে কোন কোন অঞ্চলে তাতে সাধারণ লোকের অংশগ্রহণ ঘটে"। সেক্ষেত্রে কখনও কখনও ভাগ্যান্বেষী কিছু স্থানীয় নেতা সাধারণ লোকেদের সংগঠিত করত। আবার কখনও প্রশাসনিক ভাঙনের কারণে "জনরোষ" সৃষ্টি হত।[১০৯] কিন্তু বিদ্রোহের সময় থেকেই নানা রাজনৈতিক মহল থেকে ভিন্ন ধরনের মত শোনা যাচ্ছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই তারিখে বেন্‌জামিন ডিসরেইলি ইংল্যান্ডের হাউস অফ কমন্সে জিজ্ঞাসা করেন এটা কি সেনাবিদ্রোহ, না জাতীয় বিদ্রোহ?" ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের *New York Daily Tribune* পত্রিকায় কার্ল মার্কসও একই সন্দেহ প্রকাশ করেন। মার্কস লিখছেন "[জন বুল] যাকে সেনা বিদ্রোহ মনে করছেন, সেটি আসলে জাতীয় বিদ্রোহ"। ভি.ডি. সাভারকারই প্রথম ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসচর্চার আওতার মধ্যে নিয়ে আসেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের এক প্রবন্ধে তিনি এর বর্ণনা দেন "ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ" বলে, "স্বধর্ম ও স্বরাজের" জন্য যে লড়াই করা হয়েছিল।[১১০] কিন্তু এস.এন. সেন ও আর.সি. মজুমদার এই দাবি মানতে নারাজ। তবে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে এস.বি. চৌধুরী একে সমর্থন জানান। তিনি মনে করতেন "এই বিদ্রোহে অনেক শ্রেণীর মানুষ একসঙ্গে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। দূরের হলেও এটিই ছিল পরবর্তীকালের ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে প্রকৃত পদক্ষেপ।[১১১]

সেই থেকে তর্ক চলেছে। তবে মোটমুটি ঐকমত্য দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ছিল না। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে টমাস মেটকাফ লেখেন, "একটি মতৈক্য আছে যে এই বিদ্রোহ কখনও কখনও সিপাহী বিদ্রোহকে ছাপিয়ে গিয়েছে, কিন্তু কখনই জাতীয় বিদ্রোহের পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি।"[১১২] এই বিদ্রোহ "জাতীয়" ছিল না, কারণ এর জনপ্রিয়তা ভারতের উত্তর দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল ; যেসব অঞ্চল ও গোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসনের প্রসাদভোগী ছিল, তারা ব্রিটিশের প্রতি অনুগতই থেকেছিল। ব্রিটিশের কিছু সহযোগীও ছিল। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী আগের মতই ব্রিটিশের প্রতি অনুগত ছিল। কারণ তাদের বাস্তবিক স্বার্থ এবং নতুন ধ্যানধারণার প্রতি মতাদর্শগত সমর্থন। একথা বলেছেন জুডিথ ব্রাউন।[১১৩] পাঞ্জাবি রাজপুরুষেরা হিন্দুস্তানী সেনাদের ঘৃণা করত এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পুনরুত্থানের কথা শুনে তারা শিউরে উঠত। অন্যদিকে সি. এ. বেইলি বলেছেন যারা

বিদ্রোহ করেছিল, তাদের নানারকম উদ্দেশ্য ছিল। সেগুলি সবসময় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকত না। প্রায়ই তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করত। "ভারতীয়দের এই অনৈক্যই ব্রিটিশকে সুবিধা করে দেয়..."।[১১৪] বিদ্রোহের কোন পূর্ব পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র ছিল না। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চাপাটি বা গমের আটার রুটি চালনা করে বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রচার করা হত। বিদ্রোহটা সকল অর্থেই নেতিবাচক হয়ে ওঠে। কেননা ব্রিটিশ রাজের জায়গায় বিকল্প কোন ব্যবস্থা খাড়া করার কোন পরিকল্পনা বিদ্রোহীদের ছিল না। মেটকাফ লিখছেন, "ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিদ্রোহীদের নেতারা হতাশাজনকভাবেই একে অপরের বিরোধী ছিল"। কারো আনুগত্য ছিল মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের প্রতি। অন্যদের ছিল আঞ্চলিক রাজপুরুষদের প্রতি। বিদ্রোহের নেতারা "যদি একত্রিত হয়ে পরাজিত হয়ে থাকে, তবে বিজয়ী হলে তারা একে অপরের গলা কাটিত"।[১১৫]

মেটকাফ তাঁর বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে যে মতৈক্যের কথা বলেছেন, সেই "মতৈক্য"র বিষয়ে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু সংখ্যক ইতিহাসবিদ্ প্রশ্ন তুলেছেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহীদের মধ্যে আধুনিক অর্থে ভারতীয় জাতির ধারণা ছিল না, একথা অনস্বীকার্য। সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই কৃষকদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ থাকত। অর্থাৎ তাদের কাজগুলি ছিল স্থানীয়। তবুও আগেকার কৃষক বিদ্রোহগুলির চেয়ে এটি ছিল কিছুটা আলাদা। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে অবশ্যই বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। এবং বিদ্রোহীরা নিজেদের এলাকার বাইরের প্রভাবেও প্রভাবিত হত। উত্তর ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন অংশের বিদ্রোহীদের মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগ ছিল। এবং নানারকম গুজব বাতাসে ভাসত যেগুলি তাদেরকে এক অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে রেখে ছিল। বিদ্রোহীদের সকলের মধ্যেই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—ব্রিটিশ রাষ্ট্রের প্রতি বিতৃষ্ণা। কেননা, এই রাষ্ট্রই তাদের জীবনে অনেক বিপর্যয় ডেকে আনে। কাজেই কোম্পানির পক্ষ সমর্থনকারী যেকোন কর্তৃত্বের বিরুদ্ধেই তাদের আক্রমণ শানিত হত। বিদ্রোহীরা সবাই বুঝেছিল যে, তাদের ধর্ম ও জাত আক্রান্ত। ঝাঁসির সিপাহীদের মত বিদ্রোহীরা তাদের "দীন (বিশ্বাস) ও ধরম (ধর্ম)"-এর জন্য প্রত্যেক জায়গায় লড়াই করেছে নৈতিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ; যা অনধিকারী বিদেশী শক্তির অনুপ্রবেশের ও শাসনের ফলে দুষিত হয়ে গিয়েছিল।[১১৬] গৌতম ভদ্রের ভাষায় "পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রে বিদেশী রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সম্বন্ধে যে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও বোধ জন্মাত, তার দ্বারাই বিদ্রোহীর বিদ্রোহাত্মক কাজ পরিচালিত হত"।[১১৭] যদিও বিদ্রোহীরা একে অপরকে চিনত না, হয়তো বা অভিজ্ঞতাতেও একে অপরের মধ্যে পার্থক্য ছিল, তবুও তারা একই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে একই শত্রুর মোকাবিলায় নেমেছিল। রণজিৎ গুহ লিখছেন, "তারা অস্ত্র ধারণ করেছিল, যাকে তারা পূর্বপুরুষের শাসনক্ষেত্র বলে বিশ্বাস করত, তাকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে"।[১১৮]

কার্যত সেই শাসনক্ষেত্রের অর্থটা কী ছিল? ভৌগোলিক বা সামাজিক অর্থে হয়তো সেই শাসনক্ষেত্রের ধারণা গ্রামের চেয়ে বা তদের নিকট জাতি বা জাতি গোষ্ঠীর চেয়ে বড় ছিল। রজত রায় বলেছেন তারা "হিন্দুস্তানকে" বিদেশী শাসনের জোয়াল থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিল। বিদ্রোহ চলাকালীন ধর্মীয় মিল ছিল চোখে পড়ার মত। সবাই মনে করত হিন্দুস্তান হিন্দু ও মুসলমান, সমানভাবে সকলের জন্য।[১১৯] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহীরা তাদের পুরোনো পরিচিত বিন্যস্ত অবস্থায় ফিরতে চেয়েছিল। তবে সেই বিন্যস্ত অবস্থা বলতে সতোরো শতকের কেন্দ্রীভূত মুঘল সাম্রাজ্যকে তারা বোঝায় নি। তারা ফেরাতে চেয়েছিল আঠারো শতকের ভারতের বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক বিন্যাসকে। কেননা, সেক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসকেরা অনের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। কিন্তু সকলেই রাজনৈতিক বৈধতার উৎস হিসেবে মুঘল সম্রাটকে স্বীকার করতেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা যখন বীরজিস কাদারকে অযোধ্যার রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করে, তখন তাঁকে শর্তাধীন করা হয়েছিল যে, তিনি সার্বিক নিয়ন্ত্রণাধিকারী মুঘল সম্রাটের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে চলবেন।[১২০] সেই পরিচিত দুনিয়ার প্রতীক ছিল মুঘল রাজধানী দিল্লি আর মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ। এনিয়ে বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন মতানৈক্য ছিল না। তাঁর সাম্প্রতিক কালের বইতে সি.এ. বেইলি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের মধ্যে "কতকগুলি স্বদেশভক্তি প্রণোদিত বিদ্রোহ"কে আবিষ্কার করেছেন। বেইলি লিখছেন যে, বিদ্রোহীদের দাবি ছিল "মুঘল বৈধতার বৃহত্তর পরিমণ্ডলে ইন্দো-মুঘল স্বদেশী রাষ্ট্রগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যেখানে জমি ও জনগণের মাঝে থাকবে সুস্থ সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক"।[১২১] বিদ্রোহ যত এগিয়েছে সহযোগীদের মধ্যেও ব্রিটিশ শাসনকে বিনা বিচারে গ্রহণ করার মানসিকতা তত কমেছে। যেমন কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের আনুগত্যের মধ্যেও উভয়সংকট ছিল। তাদেরও ছিল কিছু অভিযোগ, *Hindoo Patriot*-এর ভাষায়, যে "অভিযোগগুলি ছিল বিদেশী শাসনের অধীনতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত"। এই পত্রিকাটি বুদ্ধিজীবীদের উভয়সংকটের বিষয়টিকে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করে লিখছে "এই আনুগত্য সম্ভবত হৃদয় অপেক্ষা মস্তিষ্কের নিকটতর স্থান থেকে উদ্ভূত হয়েছে"।[১২২] কাজেই বলা চলে ১৮৫৭–৫৮খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আপত্তি ও অসন্তোষের স্বর শোনা গিয়েছিল, যদিও তা উদাত্ত কণ্ঠে মুক্তির আহ্বান ছিল না। সাম্প্রতিককালে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার দোলক উল্লেখযোগ্যভাবে বিপরীত দিকে চলে গিয়েছে।

আলোচ্য বিদ্রোহের চরিত্র নিয়ে অন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল এই বিদ্রোহ উচ্চকোটির বিদ্রোহ ছিল কিনা। জুডিথ ব্রাউনের মত কিছু কিছু ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, বিদ্রোহ চলাকালে সামন্তপ্রভুরাই ছিল সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জমিদার শ্রেণীর লোকেদের উপস্থিতি বা

অনুপস্থিতির দ্বারাই বিদ্রোহের চেহারাটা অনেকটা নির্ধারিত হত। কারণ তারাই একমাত্র বিদ্রোহকে একটা সাধারণ রূপ দিতে পারত।[১২৩] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের গ্রামীণ বিদ্রোহ মূলতই ছিল উচ্চকোটি চরিত্রের। এ সিদ্ধান্ত এরিক স্টোক্‌সের।[১২৪] এদিক থেকে দেখলে বিদ্রোহে জনসাধারণের ভূমিকাটা তুচ্ছ হয়ে পড়ে। সামন্তপ্রভুদের ব্যাপারে বলা চলে যে অনেকক্ষেত্রেই তারা নেতৃত্ব নিতে অনিচ্ছুক ছিল। বিদ্রোহীরা তাদেরকে ঠেলে দিয়েছিল নেতার আসনের দিকে। বাহাদুর শাহ হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন যখন বিদ্রোহী সিপাহীরা তাঁকে নেতৃত্বের প্রস্তাব দেয় এবং অনেক ইতস্তত করেই তিনি বিদ্রোহীদের নেতা হতে রাজি হয়েছিলেন। কানপুরে নানা সাহেবকে বিদ্রোহীরা সিপাহীরা তুলে ঘেরাও করে ভয়ঙ্কর পরিণতির হুমকি দেয়; একথা পরে তাঁতিয়া তোপির স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়। নানা সাহেবের বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মেলানো ছাড়া অন্য কোন রাস্তা ছিল না।[১২৫] ঝাঁসির রানীকে কার্যত মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হয়, যদি তিনি সিপাহীদের সাহায্য না করেন অথবা ব্রিটিশের সহযোগী হন।[১২৬] বিদ্রোহ শুরু করার উদ্যোগ এবং এর কার্যকারিতা আদপেই সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করেনি।

তালুকদারদের বিষয়ে নজর দিলে একটি ব্যাপার চোখে পড়ে। অনেক জায়গাতেই কৃষকেরা তালুকদারদের নেতৃত্বকে মেনে চলত। একথা ঠিক কারণটা হল প্রাক্-ধনতান্ত্রিক যুগে দুটি শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক। কিন্তু এক এক অঞ্চলে তালুকদারদের ভূমিকা এক এক রকম ছিল। উদাহরণ হিসেবে রুদ্রাংশু মুখার্জী দেখিয়েছেন যে, অযোধ্যায় বিদ্রোহে তালুকদারদের অংশগ্রহণ মোটেই সর্বজনীন ব্যাপার ছিল না। তাদের কেউ কেউ ব্রিটিশের প্রতি অনুগতই থেকে গিয়েছিল। কেউ কেউ আবার দলত্যাগী হয়েছিল। অর্থাৎ বিদ্রোহীদের পক্ষ ত্যাগ করে ব্রিটিশের দলে নাম লিখিয়েছিল। অন্যেরা মধ্যপন্থা অনুসরণ করে। কেউ কেউ ব্রিটিশবাহিনীকে আসতে দেখেই বশ্যতা স্বীকার করে বসে।[১২৭] অনেক জায়গাতেই বিদ্রোহের উদ্যোগটা এসেছিল অন্য শ্রেণী থেকে। সামন্ত শ্রেণী থেকে নয়। কৃষক ও হস্তশিল্পীরা জোর করে তালুকদারদের বিদ্রোহে টেনে নামায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনসাধারণ বিদ্রোহ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিল, তালুকদারেরা ব্রিটিশের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করার পরেও। সর্বোপরি প্রধান উদ্যোগটি এসেছিল সিপাহীদের তরফ থেকে যাদেরকে বলা যেতে পারে উর্দিপরা কৃষক। এখন তারা উর্দি ছেড়ে আবার সেই কৃষকদের সঙ্গেই মিশে যায়। উত্তর ও মধ্য ভারতের প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই সেনা ছাউনিতে উত্থানের প্রভাব পার্শ্ববর্তী গ্রামেও পৌঁছে যায়। সিপাহীদের জাতিগত বন্ধনও কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র গড়ে তোলে। প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই বিদ্রোহীদের বিদ্রোহাত্মক কাজের আগে তাদের সভা-সমাবেশ বা প্রকাশ্যে আলোচনা সভা বসত। এবং সর্বোপরি চাপাটি ছড়িয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দ্রুত গতিতে গুণত্তর প্রগতিতে বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন সংবাদ

পৌঁছে দেওয়া হত। এই চাপটি ছিল আসন্ন সংকটের পূর্বলক্ষণ। কারণ বা সূচক নয়।[১২৮] ১৮৫৭–৫৮ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে কৃষকদের স্বেচ্ছা অংশগ্রহণের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা কঠিন।

বিদ্রোহ নৃশংসভাবে দমন করা হয়। কলকাতায় সৈন্য জড় করে লর্ড ক্যানিং ব্রিটিশবাহিনী পাঠিয়ে দেন দিল্লি মুক্ত করার উদ্দেশ্যে। চূড়ান্তভাবে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি পুনরধিকার করা হয়। বাহাদুর শাহ জাফরকে বন্দী করা হয়। পরে তাঁকে নির্বাসন দেওয়া হয়। কিন্তু এতেই বিদ্রোহ শেষ হয়নি। খুবই ধীরে ধীরে বারাণসী, এলাহাবাদ ও কানপুর পুনরধিগ্রহণ করা হয়। বিদ্রোহীরা প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই করেছিল। আর ব্রিটিশরা পল্লী অঞ্চলে চরম সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। অক্টোবর মাসে কলকাতায় নতুন ব্রিটিশবাহিনী এসে হাজির হয়। ফলে ক্ষমতার পাল্লা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে চলে যায়। ১৮৫৭ এবং ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের শুরুর মাঝে ব্রিটিশ বাহিনী আস্তে আস্তে গোয়ালিয়র, দোয়াব, লখনউ ও অযোধ্যার বাকি অংশ, রোহিলখণ্ড, এবং মধ্য ভারতের বাকি অংশ পুনরাধিকার করে নেয়। বিদ্রোহীদের পরাজয়ের সমকালীন ঔপনিবেশিক ব্যাখ্যায় ব্রিটিশের সাহসিকতা, শ্রেষ্ঠ জাতীয় চরিত্র, উচ্চতর নেতৃত্বগুণ ও সমরকুশলতা এবং অন্যদিকে বিদ্রোহীদের শৃঙ্খল ও ঐক্যের অভাবের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আগেকার কিছু ভারতীয় ঐতিহাসিকেরাও একই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অবশ্য বলবেন ব্রিটিশ জিতে গিয়েছিল কারণ সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য অসংখ্য লোক ও প্রচুর সম্পদ তারা বিনিয়োগ করে। অন্যদিকে তীব্র অর্থসংকটের কারণে সিপাহীদের পরাজয় ঘটে। কৃষকদের সেনাবাহিনীতে গ্রামীণ বিদ্রোহীদের অস্ত্র ছিল পুরোনো ধাঁচের। তার ওপর তারা কোন প্রশিক্ষিত সেনাও ছিল না। আর তারা যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিল, তা শুধুমাত্র অত্যন্ত উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতই ছিল না, ছিল গোটা ভারতের প্রভু, ছিল কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের সমর্থনপুষ্ট, ছিল কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা সম্পর্কিত। আরও একটা কথা এরিক স্টোকসের ভাষায় বলা চলে। সেটা হল বিদ্রোহী সিপাহীদের মধ্যে "কেন্দ্রাভিমুখী হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যে কারণে তারা দিল্লিতে জড় হয়"। এর ফলে বিদ্রোহ যতদূর ছড়াতে পারত, ততটা ছড়ায়নি। কাজেই ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে দিল্লি ও লখনউয়ের পতন ঘটলে বিদ্রোহের দিন ঘনিয়ে আসে।[১২৯] বিদ্রোহ অত্যন্ত স্থানীয় চরিত্রের হওয়ায় ব্রিটিশের পক্ষে এক এক করে সেগুলির মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছিল। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই সব শেষ হয়ে যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই বলতে হয় এই বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শেষ হয়। ভারতে শান্তি পুরোপুরি ফিরে আসার আগেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের জন্য ভাল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের ২ তারিখে

একটি আইন পাশ করে যার নাম ছিল 'অ্যাক্ট ফর দি বেটার গভর্নমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া'। সেই আইন অনুযায়ী রানী ভিক্টোরিয়াকে ব্রিটিশ ভারতের সাম্রাজ্ঞী ঘোষণা করা হয়। আর মন্ত্রিসভার এক সদস্যকে ভারতের জন্য সচিব পদে (সেক্রেটারি অব্ স্টেট ফর ইন্ডিয়া) নিয়োগ করা হয়। ১লা নভেম্বর থেকে উক্ত আইন বলবৎ হওয়ার কথা ছিল। ঐ দিনই রানী একটি ঘোষণাপত্র জারি করেন। সেই ঘোষণায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, ভারতীয়দের ধর্মীয়ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা মেনে চলা হবে এবং প্রতিষ্ঠিত প্রথাপ্রকরণ অনুযায়ী শাসনকাজ পরিচালনা করা হবে।[১৩০] ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবস্থান প্রসঙ্গে সাংবিধানিক এই পরিবর্তনের অর্থের সারাৎসার করেছেন বার্নার্ড কোন্। তিনি বলেছেন যে, "শব্দগত ধারণায় দেখা যায় ব্রিটিশ এদেশে তাদের শাসন শুরু করেছিল, 'বহিরাগত' হিসেবে, নিজেদের সম্রাজ্ঞীর হাতে ভারতের সার্বভৌমত্বকে সঁপে দিয়ে তারা হয়ে উঠেছিল 'ভেতরের লোক'..."।[১৩১] ঘোষণায় সম্রাজ্ঞী, ভারতে তাঁর প্রতিনিধিরা, ভারতীয় প্রজাবর্গ, রাজপুরুষেরা সকলেই সাম্রাজ্যের উচ্চতার ক্রম অনুযায়ী সম্পর্কিত হল। এছাড়া বর্ষব্যাপী রক্তাক্ত জাতিদাঙ্গার পরিণামও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। সিপাহীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের গুরুতর অভিযোগ আনা হয়। এর ফলে ব্রিটিশ রাজ সব ভারতীয়দেরকেই সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে, ভারতে ও ব্রিটেনে উভয় জায়গাতেই। সিপাহীদের অত্যাচারের গল্প ছড়ানোয় দাবি ওঠে শাস্তির ও প্রতিশোধ নেওয়ার। ভাইসরয় লর্ড ক্যানিংয়ের মত শান্ত মাথার লোক বিকৃত গণদাবিকে সংযত করার চেষ্টা করলে নিজের দেশের লোকেদের কাছেই তিনি উপহাসাস্পদ হয়ে ওঠেন এবং "ক্ষমাশীল ক্যানিং" এই আখ্যা জোটে। তাঁকে ভারত থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য রানীর কাছে অনুরোধও করা হয়। এই পাগলামি যদিও আস্তে আস্তে কেটে গিয়েছিল, তবুও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ-ভারতীয় সম্পর্কের ওপর এই ঘটনার স্থায়ী ছাপ থেকে যায়। জাতিগত পৃথকীকরণের ব্যাপারটি এখন থেকেই গেড়ে বসে। যেহেতু ভারতীয়দের শুধুমাত্র জাতিগতভাবে আলাদাই মনে করা হত না, নিকৃষ্টও মনে করা হত। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, ভিক্টোরিয় পর্বের সেই আত্মবিশ্বাসী উদারনৈতিক সংস্কারবাদী প্রবল উৎসাহ আর ছিল না, যেহেতু ভারতীয়দের মনে করা হত সংস্কারের অযোগ্য। টমাস মেটাকাফের ভাষায় "এই রক্ষণশীল মার্কা উদারনৈতিকতার পিছনে ছিল রক্ষণশীল ও অভিজাত শ্রেণীর পূর্ণ সমর্থন এবং ভারতীয় সমাজের পরম্পরাগত কাঠামোয় সম্পূর্ণ অনহস্তক্ষেপ নীতি"।[১৩২] এই ধরনের রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্বৈরতন্ত্রী হয়ে ওঠে। ক্ষমতা ভাগাভাগি করার ব্যাপারে ব্রিটিশ রাজ শিক্ষিত ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করে। এর ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আবার আঘাত পাবার সম্ভাবনাযুক্ত হয়ে ওঠে। কারণ উনিশ শতকের শেষ দিকে আধুনিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই আশা ভঙ্গের হতাশা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল।